হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
এইচ, এম, সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫৮৮৫৪
মোবাইল : ০১৬৭০৭৪৪৭০১
ফ্যাক্সঃ

বিস্‌মিলাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আলাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

তারিখ : ০২-১২-০৭

ঘূর্ণিঝড় সিডরকে কেন্দ্র করে বিদেশীদের উপস্থিতি: জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

১. সূচনা

ঘূর্ণিঝড় সিডর বাংলাদেশের উপকূলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করার পর বরাবরের মতোই সমগ্র দেশবাসী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সরকারী হিসাব মতে তিন হাজারের অধিক মানুষ এই ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়াও হাজার হাজার মানুষ এখনো নিখোঁজ, যাদের অধিকাংশ নিহত বলে ধারণা করা হয়। আমরা ঝড়ে নিহত সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর ঐতিহ্যগতভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের দুর্গত মানুষেরা যেমন দারুণ সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে, তেমনি সমগ্র দেশবাসী, প্রশাসন ও সশস্ত্রবাহিনী সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্গত মানুষগুলোর পাশে এসে দাড়ায়। এটাই আমাদের ইতিহাস।

সিডরের পূর্বাভাস পেয়েই মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশে রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নেয়। মার্কিন নৌসেনাদের ওয়েবসাইটে বলা হয় বাংলাদেশেস্থ মার্কিন দূতাবাসের পরামর্শ অনুযায়ী ১৬ই নভেম্বর যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা ১৭ই নভেম্বর, শনিবার, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার কথা জানালেও সেদিন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের জরুরী বৈঠক শেষে সরকারের আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে এসব ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশের জলসীমায় কখন প্রবেশ করেছে তাও জানিয়েছে মার্কিনীরা। মোদ্দা কথা হচ্ছে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের আগমন সম্পর্কে দেশবাসী সরকারের কাছ থেকে কিছুই জানতে পারেনি, মার্কিনীরাই জানিয়েছে তাদের সার্বিক কার্যক্রম। সরকারের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই মার্কিনীরা একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এদেশে আসার, থাকার এবং নিজেদের পছন্দমত কাজ করার।

বাংলাদেশের বর্তমান দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্গতদের জন্য দেশীয় সাহায্যের পাশাপাশি বিদেশী সাহায্যও দরকার। কিন্তু এই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী, প্রশাসন ও জনগণই যথেষ্ট। তাছাড়া মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি কোন ত্রাণ নিয়ে আসেনি। পুরো জাহাজটিই একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধজাহাজ। এতে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং তিন হাজার সেনা। ইতিমধ্যেই তারা বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে। যারা নিজেদের দেশেই দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তাদের বাংলাদেশে আগমনের পেছনে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক-আফগানিস্তানে গণহত্যা আর গণধর্ষণে ব্যস্ত, তারা হঠাৎ ত্রাণের নামে বাংলাদেশে কেন?

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ কবে যাবে সেই বিষয়টিও জাতির কাছে পরিষ্কার নয়। একদিকে সরকার বলছে প্রয়োজনের চেয়ে এক দিনের বেশি তারা থাকবে না। আর অন্যদিকে মার্কিনীরা বলছে যে, যতদিন প্রয়োজন, ততদিনই তারা থাকবে। এই দুই কথার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। অথচ এই প্রয়োজন কে নির্ধারণ করবে সে সম্পর্কে কারও কোন বক্তব্য নেই। আসলে পুরো পরিস্থিতি দেশবাসীর কাছে ঘোলাটে করে রাখা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন দেশের এই সময়ের সুযোগে যখন বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করেছে, তখন বিশ্ব রাজনীতি ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির সাথে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি মিলিয়ে দেখা জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে একান্ত জরুরী। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির বর্তমান গতিপ্রকৃতি বিশেষণ করে তার আলোকে বঙ্গোপোসাগরে মার্কিন রণতরীর উপস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

২. জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মার্কিনীরা মানবতার স্বার্থে কোথাও গিয়েছে এমন ইতিহাস নেই – তারা হয় করেছে যুদ্ধের মহড়া, না হয় গণহত্যা। Global Policy Forum নামে একটি ওয়েবসাইটে দুর্গত মানুষের সাহায্যে বিদেশী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বিশেষণ করতে গিয়ে বলা হয় – "When nations send their military forces into other nations' territory it is rarely (if ever) for "humanitarian" purposes. They are typically pursuing their narrow national interest - grabbing territory, gaining geo-strategic advantage, or seizing control of precious natural resources." অর্থাৎ যখন কোন দেশ আরেকটি দেশের মাটিতে সামরিক বাহিনী পাঠায় তা আর যাই হোক, কখনোই মানবতার খাতিরে নয়। সামরিক শক্তি প্রেরণকারী দেশ সাধারণত তাদের ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যেই করে থাকে; যেমন, দেশ দখল, ভূ-কৌশলগত সুবিধা লাভ অথবা মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরীর উপস্থিতি বিশেষণ করতে হলে সর্বপ্রথম দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিন, ভারত ও চীনের জাতীয় স্বার্থ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। এছাড়া দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ (তথা: পাকিস্তান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) মার্কিন, ভারত ও চীনের রাজনৈতিক কৌশলের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

২.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি: এশিয়ার দুই উদীয়মান শক্তি চীন ও ভারতকে কেন্দ্র করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান। চীন সম্পর্কে বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস ২০০০ সালে নির্বাচনী প্রচারণায় সময়ই বিখ্যাত ফরেন এ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন “China ... resents the role of the United States in the Asia-Pacific region. ... China is not a 'status quo' power but one that would like to alter Asia's balance of power in its own favor. That alone makes it a strategic competitor, not the `strategic partner' the Clinton administration once called it". আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে তিনি বলেন "... the United States must deepen its cooperation with Japan and South Korea and maintain is

commitment to a robust military presence in the region." তিনি আরো বলেন, ওয়াশিংটনকে অবশ্যই আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য আনার জন্য ভারতের ভূমিকার দিকে গভীর মনযোগ দিতে হবে এবং ভারতকে একটি চীন বিরোধী মৈত্রী ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে ।

১৮ই অক্টোবর, ২০০৭ তারিখে জয়েন্ট চীফ অব ষ্টাফ এর নতুন চেয়ারম্যান অ্যাডমিরাল মাইকেল মুলেন ইরাক-আফগানিস্তানের অবনতিশীল অবস্থা থেকে সকলের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়ে পেন্টাগনের নতুন যুদ্ধ ফ্রন্ট সৃষ্টির পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন “[US] ...refocus the military's attention beyond the current wars to prepare for other challenges, especially along the Pacific rim and in Africa." এছাড়াও ২০০১ সালের ৯/১১ এর পর অনেক আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষক ক্রমাগত ধারণা করেছিলেন যে এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে ব্যাপকভাবে সামরিকীকরণ করা হবে।

২.২ চীনের দৃষ্টিভঙ্গিঃ চীন অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে যা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগের বিষয়টি ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানী তথা তেল চীনকে বিপুল পরিমাণে আমদানী করতে হয় সাগরপথে মালাক্কা প্রণালী হয়ে, যা মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অবস্থিত। নভেম্বর ২০০৩ সালে চীনা সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া নিউজ এজেন্সী রিপোর্ট করে যে, প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও বলেছেন কিছু বড় দেশ মালাক্কা প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে চীনের নিজস্ব কৌশল প্রণয়নের কথা তিনি বলেন। ২০০৫ সালের অক্টোবর ৭ তারিখে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল চীনের উদ্বেগের বিষয়টি এভাবে তুলে ধরে - "The U.S. is the only power with sufficient naval forces to enforce a blockade of the 900 kilometter waterway that borders Malaysia, Singapore and Indonesia."

২.৩ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিঃ কর্তৃত্বের দিক থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারত হতে চায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী তথা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আঞ্চলিক পর্যায়ে বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত কোথাও ভারত চায় না তার আধিপত্যবাদে কেউ বাগড়া দেয়। যত কৌশলগত মৈত্রীই হোক না কেন, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। তাই মার্কিন যুদ্ধজাহাজের বাংলাদেশে প্রবেশের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রনব মুখার্জী এদেশের দশটি বিধ্বস্ত গ্রাম পুন:নির্মাণের সুযোগ দাবী করে পরিষ্কারভাবে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন ।

২.৪ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতিঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতি চীন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও শক্তির ভারসাম্য সম্পর্কে এই ধারণা নিয়ে আমরা মার্কিনীদের বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতা এবং এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি সম্পর্কে বিশেষণ শুরু করতে পারি। ইন্দোনেশিয়ায় ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সংঘটিত সুনামিতে ত্রাণ সহায়তা দেয়ার নামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহর সাম্প্রতিক সময়ে প্রথমবারের মত ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি আসে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজের বহর এই সময়ে থাইল্যান্ডের সিয়াম উপসাগরের ইউ টাপাও ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। সুনামির জরুরী ত্রাণ তৎপরতা শেষ হয়ে যাবার পরও যুদ্ধজাহাজ অবস্থান করতে থাকলে তৎকালীন নির্বাচিত থাই সরকার মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে চলে যেতে বলে। সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে

নির্বাচিত সরকারকে সরানো হলে সামরিক সরকারের সর্বপ্রথম কাজ ছিল ইউ টাপাও সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের জন্য মার্কিন নৌবাহিনীকে অনুমতি দেয়া।

একই সময়ে মার্কিনীরা ইন্দোনেশিয়ার বান্দা আচেহ্র সুলতান ইস্কান্দার বিমান ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। এই বিমান ঘাঁটি মালাক্কা প্রণালীর মুখে এবং মায়ানমারের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। মার্কিন বাহিনী বলেছে যে কবে তারা তাদের 'সম্পদ' (তথা নৌবহর) ফেরত নিয়ে যাবে সে ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা নেই। একই সময়ে কম্বোডিয়ার 'রিম' নৌঘাঁটিতে মার্কিন নৌবহর প্রবেশ করে এবং এখন তারা এই নৌঘাটি আরো সমৃদ্ধ করতে ব্যস্ত। আর চীনের জন্যে কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ মায়ানমার এখন মার্কিন-চীন দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। মায়ানমারের উপকূলে বঙ্গোপসাগরে চীন একটি গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরী করছে। এছাড়া চীন মায়ানমারে প্রায় ২,৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাইপলাইন তৈরী করছে যা বঙ্গোপসাগরের সিটই গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিং পর্যন্ত বিস্তৃত। মার্কিনীরা যেভাবে মধ্যএশিয়ায় কমলা, গোলাপী ইত্যাদি রঙ্গীন বিপব ঘটিয়েছে, আজকে তারা সেভাবে মায়ানমারেও গেরুয়া বিপব ঘটাতে তৎপর।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মার্কিনীদের স্বার্থ মূলত ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত। ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ভারত ও চীনের সংযোগস্থলে। শুধু তাই নয়, ভৌগলিক দূরত্বের দিক থেকে চীনে পৌঁছার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান মার্কিনীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক। এই গুরুত্বের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি করতে উদগ্রীব। বাংলাদেশে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের আগমনকে সেই আলোকেই দেখতে হবে। কোথায় ঘাঁটি করলে সুবিধা হয় তা যাচাই করে দেখার জন্যই আজকে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশে এসেছে। এছাড়াও স্বল্প মেয়াদে তারা আরো কয়েকটি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় :

১. বর্তমান সরকারের পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দেখানো ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মার্কিনীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা প্রমাণ করা যুদ্ধজাহাজ আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এখনো রয়েছে ইরাক-আফগানিস্তানে শহীদ মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ত। ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্য করে তারা সেই রক্তের দাগ মুছে বিশ্বব্যাপী তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে চায়।

আজকে বাংলাদেশে মার্কিন যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতি নিয়ে যে লুকোচুরি করা হচ্ছে, একই ঘটনা আমরা ইরাকেও লক্ষ্য করেছি। ইরাকের বর্তমান সরকার বলছে প্রয়োজনের বেশি একদিনও মার্কিন সেনারা থাকবেনা। আর সেখানে মার্কিনীরা বলছে যতদিন প্রয়োজন, ততদিনই তারা থাকবে। ইরাকে সামরিক বাহিনীর অবস্থানের সময়সীমা মার্কিনীরা নির্ধারণ করছে তাদের নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতে। আজকে বাংলাদেশেও মার্কিন যুদ্ধজাহাজের অবস্থানের সময়সীমা নির্ধারণ করবে মার্কিনীরাই, তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত মহাসাগরে নিজেদের সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এজন্য যতদিন তাদের বঙ্গোপসাগরে থাকা প্রয়োজন, ততদিনই তারা থাকবে।

৩. উপসংহার

আমরা সবাই জানি আজকে ১৬টি মুসলিম দেশে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। আর সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের হিংস্র থাবায় গোটা মুসলিম জাহান আজ রক্তে রঞ্জিত। এই হায়েনাদের তান্ডবে ধ্বংস হয়ে গেছে ইরাক ও আফগানিস্তান। ঘূর্ণিঝড় সিডর উপলক্ষে

আগত মার্কিন যুদ্ধজাহাজ কিয়ারসার্জ থেকেই ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছে। আর এই যুদ্ধজাহাজের ২২তম মেরিন এক্সপেডিশনারী ইউনিটের সৈনিকরাই ইরাক-আফগানিস্তানে মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর চরম নির্যাতন করেছে। তারা কিছুদিন আগেও পারস্য উপসাগরে ইরান আক্রমণের মহড়া দিচ্ছিল। যেই দস্যুদের নির্মমতায় সারা পৃথিবী শংকিত, যারা প্রতিদিন গণহত্যা আর গণধর্ষণ করছে, সেই নিষ্ঠুর মার্কিন সৈন্যরা বাংলাদেশের মাটিতে নেমেছে ত্রাণ দেবার জন্যে, তা বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

আমাদের মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে যতবারই মার্কিন যুদ্ধজাহাজ এসেছে ততবারই তারা এদেশ ও দেশের মানুষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। ১৯৭১ সালে এদেশের মজলুম মানুষের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল বঙ্গোপসাগরে আগত মার্কিন সপ্তম নৌবহর। ১৯৭৪ সালে খাদ্য এনে তা ফেরত নিয়ে গেছে মার্কিন জাহাজ। যার ফলে দুর্ভিক্ষে এদেশে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৯১ সালে সাইক্লোনে সাহায্য করতে এসে তারা বাংলাদেশকে হানা চুক্তি নামে একটি দাসত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে। আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে মার্কিনীদের আগমনের প্রতিক্রিয়ায় আজকে ভারত বাংলাদেশের দশটি গ্রাম চাচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান নতজানু পররাষ্ট্রনীতি কোন অবস্থাতেই বিদেশী হস্তক্ষেপ রোধ করতে পারছে না। আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বন্ধু রাষ্ট্র বিবেচনা করে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেওয়া হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন:

(১) "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা; তারা শুধুমাত্র তোমাদের ধ্বংসই কামনা করে। বাস্তবে শত্রুতা তাদের মুখ হতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে আর তাদের অন্তরে যা আছে তা আরও ভয়াবহ।" (সূরা আল ইমরান : ১১৮)
(২) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা, তারা একে অপরের বন্ধু ...। (সুরা মায়েদা - ৫১)

উপরোক্ত আয়াতসহ অসংখ্য আয়াত ও রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ থেকে এটা স্পষ্ট যে কোন ইসলামী রাষ্ট্র কখনই বিদেশী শক্তির আধিপত্য মেনে নিতে পারেনা। আজকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা যখন বিপন্ন, তখন আমাদের সবাইকে সচেতন ও সংগঠিত হতে হবে। আমাদেরকে দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় মার্কিন-ভারত-ইইউ-বৃটেন-ইসরাইলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আসুন, আমরা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও নৌসেনাদের উপস্থিতির প্রতিবাদ জানাই এবং নিম্নোক্ত দাবিতে সোচ্চার হই –

১. অবিলম্বে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাহার করতে হবে

২. যুদ্ধজাহাজ প্রত্যাহারের তারিখ এই মুহূর্তে ঘোষণা করতে হবে।

দেশ, জাতি ও ইসলামের প্রয়োজনে আজকে সবাইকে আন্দোলন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ, যখন আলাহ্ ও তাঁর রাসূল এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে, তখন সেই আহ্বানে সাড়া দাও।" [সূরা আনফাল: ২৪]

প্রথম ড্রাফ্ট:
০২ ডিসেম্বর, ২০০৭
ঢাকা